KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬২ গ্রীন পার্ক, কলকাতা-৫৫
Collection : KLMLGK	Publisher : রাখাল বিশ্বাস
Title : অধুনা (ADHUNA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 10 11	Year of Publication : ১৩৮০ শারদীয় সংখ্যা ১৩৮১ শারদীয় সংখ্যা
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : রাখাল বিশ্বাস, শুভানন্দ মজুমদার	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অঘ্রান

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

সম্পাদক
রাখাল বিশ্বাস
পঞ্চানন মালাকর

অধুনা সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক

১০ম বর্ষ : শারদীয় সংখ্যা ১৩৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র কলিকাতা-৭০০ ০০৯

॥ সূচীপত্র ॥

প্রবন্ধ

কবি আনন্দ বাগচী সম্পর্কে : কয়েকটি মগ্ন উচ্চারণ

কৃষ্ণা বসু

কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অরুণ ভট্টাচার্য বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায় আলোক সরকার প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় সুনীল বসু শুদ্ধসত্ত্ব বসু অভী সেনগুপ্ত মঞ্জুষ দাশগুপ্ত বাসুদেব দেব পঞ্চানন মালাকর নৃসিংহ মুরারি দে মৃণালকান্তি দাশ রঞ্জন ভাদুড়ী শোভন মহাপাত্র সনৎ মান্না গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী অজয় নাগ সন্দীপ সেন শেখ মহরম আলি সত্য বিশ্বাস প্রমোদ বসু শ্যামলকান্তি মজুমদার বাসব দাশগুপ্ত, গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপল চৌধুরী অশোক দত্তচৌধুরী শ্যামলকান্তি দাশ ব্রততী সিংহরায় নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রদোষ দত্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় দেবপ্রসাদ মিত্র মৃণাল দত্ত রাণা চট্টোপাধ্যায় সুব্রত রুদ্র পবিত্র মুখোপাধ্যায় ধূর্জটি চন্দ রবীন সুর গৌরাঙ্গ ভৌমিক উত্তম দাশ অজয় সেন রথীন্দ্র মজুমদার মনুজেশ মিত্র সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত বাসব দাশগুপ্ত মলয় সিংহ হান্নান আহসান রত্নেশ্বর হাজরা দেবী রায় সঞ্জীব প্রামাণিক কার্তিক বৈরাগী সাধনা মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক : রাখাল বিশ্বাস পঞ্চানন মালাকর

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

কার্যালয় : ৩২ গ্রীণ পার্ক কলকাতা-৫৬

দাম ॥ দুই টাকা

কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হলদিয়ায়

মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে যখন আমরা
হলদিয়ায় পৌঁছাই,
নদী আর আকাশকে তখন
আলদা করে চিনা যাচ্ছিল না।
মনে হচ্ছিল,
হয় আকাশের মধ্যে নদীটা হারিয়ে গেছে, কিংবা
নদীর মধ্যে আকাশ।

পরদিন সকালে সূর্য উঠল।
তখন দেখলুম,
এত বৃষ্টিতেও নদীর রঙ একটুও পালটায়নি। কিন্তু
আকাশের রঙ টলটলে নদী।
ঘোলা জলের ছোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই যেন
আকাশটা হঠাৎ
অনেক উঁচুতে চলে গেছে।

অরুণ ভট্টাচার্য

কঠিন মুখে কঠিনতর হাসি

(অম্লান দত্ত বন্ধুবরেষু)

লোকটা দাঁড়িয়ে। সোজা দেবদারু বা
সুপুরিগাছের ঋজুতা। তার
বাগানের কিছু কাঁটালতা, কিছু রাঙা কাঁকর
লৌহ দরজায় ভারি তালা। তার
ঘরময় নিস্তব্ধতা।
আমি সেই লৌহ দরজার তালা খুলতে চেয়েছিলাম।
বাগানের মাঝখানে লোকটা
ঋজু দাঁড়িয়ে। কঠিন মুখে
কঠিনতর হাসি। যেন
মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে, কি যেন
বলবে বলে।
তাকিয়ে দেখি, তার দুপাশে দুটি
ধবধবে খরগোশ, চঞ্চলতায়
গাছপালা নবীন ছায়া ফেলেছে।
আদর করে গায়েপিঠে উঠছে, যেন
বাগানটুকুর সাম্রাজ্য ওদেরি হাতে।
লোকটার কঠিন মুখে কঠিনতর হাসি
তখনও।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এখন তিনি

সিন্ধুঘোটক
ছিলেন ঘটক।

এখন শুধুই
ঘোট পাকান
জলের মধ্যে
জট পাকান

কলকাতা, গৌহাটি, কটক
সবার সঙ্গে
সবার আড়ি
তাই বাঁধাতে
হাওয়া গাড়ি
চ'ড়ে তিনি মস্কো যান

সেখান থেকে ওয়াশিংটন
সঙ্গে নিয়ে তাঁর বৌঠান।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দর্শক

একটি কিশোর আনন্দের খনি;
দাঁড়িয়ে আছে বিরল আলপথে
ঘাড়ের দাঁড়ে ভোররঙা এক পাখি।

ঘটাবে নাকি আত্মপ্রদর্শনী ?
সেই ভয়ে এক টিলায় বসে থাকি
জননী আছে, কিংবা দিন রজনী

নিরপেক্ষ আনন্দই ছড়াবে ?
ভাবতে গিয়ে আমার হৃদয় থেকে
ঝরতে থাকে ঈর্ষানীল শোণিত !

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বুকের কাছাকাছি

টিলার চুড়ো থেকে
ধুলোয় নেমে আসি।
বাঁধের বাঁকা চাঁদ
হাতের ভাঙা বাঁশী
ঝর্ণাজলে ফেলে
কেন যে নেমে এলে,
ধুলোয়, ফাঁকা মাঠে—
বেদনা হয় জড়ো
বেদনা খুবই বড়ো
বুকের কাছাকাছি।

আলোক সরকার

আঁধারিম

প্রথমত কৌতূহল। আর তারপর
সেই অন্বেষণ-অন্বেষণের
কথাটাই সকলের জানা, তার শ্রম

তার উৎসুক্যের ভিতরের খরতা। আমরা
কতো অপ্রয়াস ভাবছি সেই
কৌতূহল—আমরা তাই-ই ভাববো।

আমাদের চলা থেকে থেকেই থেমে যাচ্ছে
বিবশ নিথর হচ্ছে আমাদের
পর্যবেক্ষণ, ঠিক একইরকম

যে রকম আঁধারিম সেই দুপুর
ঘুঘু ডাকছে আর শূন্যময়
একটা থাকা আর তার সামনে

আমাদের সেই কৌতূহল ঠিক
একইরকম যেমন
আমাদের থেকে থেকেই থেমে-যাওয়া!

সব শ্রম সব উৎসুক্য শ্রমের
এমন কঠোরতা তবু
কেউ জানতেই পারছেনা, দেখছেই না

বারবার আঁধারিম হচ্ছে আমাদের
অগ্রগমন, বারবার ঘুঘু ডেকে উঠছে
শূন্যময় হয়ে উঠছে সার্বজনীন যাবতীয় থাকা!

প্রবেন্দু দাশগুপ্ত

কোনো দুঃখ নেই

যে-মুহূর্ত চ'লে গেছে, তার জন্য কোন দুঃখ নেই।
অদ্ভুত আলোয় আজ ভ'রে গেছে গাছপালা বাড়ি
এরই মধ্যে জেগে ওঠে জল থেকে বালিয়াড়ি,
গাছের শিকড় থেকে গাছ।
হয়তো বা পালটে যেতে হবে আমাদের, হয়তো হবে না,
তবু বুকের জামার কাছে উশখুশ করে ওঠে হাওয়া—
কারা যেন বারবার কিছু একটা ব'লে উঠতে চায়,
আরো কি এগিয়ে যাবো? কেন যাবো? কতোদূরে যাবো?
যে-মুহূর্ত চ'লে গেছে, তার জন্য কোনো দুঃখ নেই।
এখন যে বেঁচে আছি, এখন যে বেঁচে থাকতে চাই,
তার জন্যে হয়তো বা আরো কিছু স্বচ্ছ হ'তে হবে।
হাওয়া দিক পালটায়, ছাদের ওপরে ছুটো কাটা-ঘুড়ি
মুখ থুবড়ে নেমে যায়।
অদ্ভুত আলোর নিচে আমরা কি স্নান সেরে নেবো?
যে-সময় খ'সে গেছে, তার জন্য কোনো দুঃখ নেই॥

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

দূরত্ব

দূর থেকে সুদূরে চলেছি
আরো কত ব্যবধানে যে এখনো যেতে হবে!
বসেছিলাম নদীর কোল ঘেষে
আমার সমস্ত ছেলেবেলা কেড়ে নিয়ে গেল জল
গতিমান প্রতিটি নৌকার পালে উড্ডীন সাদায়
আমি দেখেছিলাম সূর্যভাঙা অনুপম মেঘ কান্তি,
স্রোতের তদ্‌বিরে টুকরো প্রতিবিম্বের পেছনে
আমি আমার জন্মনক্ষত্রটিকে তখন পাঠাতে চেয়েছিলাম!

যেভাবে বাতাস নাচে, বৃক্ষের উচ্চতা শেখে ঝলমল সবুজে
পাতাদের নৃত্য—যেন তারা দ্যুলোক নর্তকী
মেঘ, ফুল, জলের পড়োশী মানুষটির অর্থ কি
ভেবেই কি নেচে চলেছে! নৃত্য যেন বিকল্প বিদ্রুপ।
এসব দেখেই আমি দূরে যাই
হাঁপাতে হাঁপাতে উঠি বরফচূড়ার ধৈর্য্যে
তারপর নিচে তাকালেই দেখি
উদ্ভিদসমাজ, উঁচুনিচু ইটকাঠের কাঠামো
সবই কি মলিন দুঃস্থ একাকার সমতল!
এতটা মহাপ্রস্থানে উঠে ক্ষমাপ্রার্থনা মানায় না
না হলে স্পষ্টই বলতাম
নদীর আসঙ্গে কিছু পাইনি, পাহাড়
আমার ভাষায় সহজ বরফ ছাড়া
আর কিছু পারছে না মেশাতে। দুচোখে যে শুদ্ধিজল
দুঃখের প্রকৃত অভাবে এখন তাও আর উঠে আসছে না।
এমনকি ভাতও আমাকে দেয়নি তেমন কিছু

যা দিয়েছে নারী, তার জন্য কয়েকটি অক্ষরই যথেষ্ট ছিল,
বিহঙ্গকে বলতাম তুমিওকি শ্লোক দিতে চাও?

নদী বয়স নিয়েছে, পর্বত আমার
নিঃশ্বাসের সাধ্য কেড়ে বলেছে নির্জন হও
ক্রমশই হয়ে ওঠো পাথরের মতো স্থায়ী উদাসীন।
দূর থেকে সুদূরে
আমাকে যে আরো কতো নতুন দূরত্বে যেতে হবে!

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বেড়া না ডিঙিয়ে

বেড়াটা ডিঙোলে আগুনের ঘর, জানা
ছিল আমাদের দুজনেরই, তবু কেউ
ডিঙোতে চাইনি নিষেধের কাঁটাতার।

সময় কাউকে পরোয়া করে না, জানা
ছিল আমাদের দুজনেরই, তবু কেউ
একবারও তাকে আনিনি উচ্চারণে।

সূর্য ক্রমশ সরাবে যে আঁচ, জানা
ছিল আমাদের দুজনেরই, তবু কেউ
হাত বাড়াইনি রোদ্দুরে একবারও।

রোদ সরে গেছে, আগুনের ঘরে আঁচ
নিবে গেছে; শুধু অবিকল দুটি ছায়া
মনে হয় যেন এখনো দাঁড়িয়ে। কেন?

এর উত্তরই খুঁজবো বাকি জীবন।

সুনীল বসু

বিপাক

কি প্রকাণ্ড এই জটিলতার অট্টালিকা
কয়েক হাজার মানুষ এর শরীরের ফেনায়িত অঙ্কে
ক্রমগত হাবুডুবু খাচ্ছে
দিন নেই রাত নেই এর অস্তিত্বের ভয়ানক অক্টোপাশ
উবু হয়ে বসে একদিকে করছে শোষণ
আর একদিকে উগরে দিচ্ছে সভ্যতার বিষ
কারও কারও যখন জটিলতার জট ছাড়াতে ছাড়াতে
ক্লান্তি আসে, নিজকে মনে হয় পাথর কুচির বস্তা
তখন যন্ত্রচালিতের মত ফেরে আস্তানায়, আস্তাবলে,
ঝাঁঝরা মগজে আর বুদ্ধি থাকে না।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা অক্টোপাশ, গোপন জটিলতা
অসংখ্য চায়ের কাপে পানীয়ের উত্তেজনা
সিগারেটের ধোঁয়ায় ঝুলন্ত চিন্তার ফাঁকি
জীবন ও জীবিকা, আয়ুক্ষয়, অবক্ষয়
পৃথিবীর আহ্নিক বার্ষিক গতির ফাঁকে
মৃত্যুর আঁধারে নামা, নেমে যাওয়া।

জটিলতা ছাড়া, ঘাস, নালিমা, নারীমুখ, সুখচিন্তা
এসব নিছক অবাস্তব
যন্ত্র, যন্ত্রের অদৃশ্য দাঁত, গুড়ো করা দিন, সূক্ষ্ম মৃত্যু
জটিলতায় চেপ্টে গিয়ে কাঁচা চুল—পক্ক কেশ, পুরন্ত গণ্ড,—
ক্রমান্বয়ে গর্ত,
জন্তুর মতই জটিলতায় চর্বিতচর্বন
তারপর একদিন অন্ধ পঙ্গু ঐশ্বর্য সৌন্দর্যহীন জরা,
এবং ছেদ কিংবা মৃত্যু।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

অনুভব মালা—৩

অনবগুণ্ঠিত নয়, খোলামেলা মনেরও নয়,
অপরিচয়ের পুরু ঘেরাটোপে ঢাকা
রহস্যরমণী হয়ে যদি রাতে নামে, নিঃশব্দ, নিথর,
পাখির ডানায় যদি মুছে যায় সব আলো
সমুদ্রতন্দ্রায় স্তব্ধ ঢেউয়ের তর্জন।

জীবনের জানালায় দেখি কে শোনায়
ধূসর ধুলোয় ঢাকা ছেঁড়াখোঁড়া পাতাওয়ালা গ্রন্থ থেকে
অপঠিত ও অশ্রুতপূর্ব কিছু ঋক।
সামনে পুরানো এক বিস্কুটের কারখানার
মরা ধোঁয়াহীন চিমনির মতো মনে করায়—
বিগতকালের চালু একদা সমৃদ্ধ
এই ব্যস্ত চিমনি অজস্র লোকের রুজি জুগিয়েছে,
আজ শুধু স্মৃতিচিহ্ন,
পাঠ্য ইতিহাসে পোড়া কাঠকয়লার আঁচড়;
তেমনি কে তুমি বন্ধু গান জোড়, সুরে নয়—
বেতাল বেসুরো,
পাখিরা কুলায় ফিরে ঝিমিয়ে পড়েছে,
নক্ষত্রও মরে গেছে কবে,
তবু সেই প্রাক্তন আলোক রেখা এখনো এখানে
এই মায়াবনে ঝলমল করে
জীবনের অলিন্দের অন্ধকারে বসে
আমাকে শোনায় গান কে?

অভী সেনগুপ্ত

কবিতার চঞ্চলতা খুব ওড়াউড়ি করে

তুমি ব'সে থাকো আর যে কোনও আবহে রোদ্দুরের আসন্নতা
ছুঁয়ে থাকে ঐ গ্রীবা
শরীর প্রান্তরে যেতে চায়, যেন এই পৃথিবীর সহিষ্ণুতা
নিজগুণে তোমার তল্লাশে যাবে আরও—
মানুষের ইতিহাস কিছু অন্য কথা বলে, বলে এই ভাঙাচোরা
শতাব্দীর বাইরেও চ'লে যেতে জানে শতাব্দী পরিব্রাজক
উচ্ছল আঠারো কোটি বছর আগের শিলীভূত মাছের নমুনা
উঠে আসে যেরকম ভারতীয় যাদুঘরে
উঠে আসে অভিনবত্বের তৃষ্ণা-মাখা স্তব্ধ আমাদের জন্য—
শুধু তুমি ব'সে থাকো—উর্বরা, জেনেছো চেতনার বীজ ঘিরে
কবিতার চঞ্চলতা খুব ওড়াউড়ি করে জানলার কাচে মৌমাছির মতো।
ঐপারে বিস্তীর্ণ বাগান—
আধুনিকতাকে মাতৃদুগ্ধ দিয়ে ধ'রে আছো তুমি
ও-কে নষ্ট হ'তে দিওনা, ও যেন বেরোতে পারে না আর
প্রয়োজনে নিজেকে পাথর ক'রে নিও। এইটুকু
মনোযোগে থেকো তুমি।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

মৃত্যু

কে লেখে নিজের হাতে নিজের মৃত্যুর ফয়োয়ানা?
আসলে সবাই। কেউ মরে ভালোবেসে সোনারঙা
নারীর শরীর, তার কালো চুল হাত খোঁপা করা;
হয়তো সে যাদুকরী অথবা ঈশ্বরী তার পায়ে
মাথা কুটে; সেই যেন ক্লাসিক্যাল গানের ঘরাণা।

আদর্শের গিলোটিনে মাথা দেয় ছাগল-মানুষ
দারিদ্র্যের অহঙ্কারে অবিনয়ী দুরন্ত স্পর্ধায়
সন্ন্যাসী পিঁপড়ের দল হেঁটে যায় অজস্র ফুলের
উপত্যকা ফেলে রেখে ঠোঁটে শুধু অলৌকিক দানা।

কৃমিকীট মরে যায় প্রাণীকুল বার্দ্ধক্যে জরায়
এসব জীবন শুধু ধারাজলে মৃত্যুতে গড়ায়।

বাসুদেব দেব

আমার ঈশ্বরীকে

প্রতিদিন অসম্মান ছোবলায় আমার সর্ব অঙ্গ
রাগ দুঃখ বিষন্নুন জমতে থাকে আমার লোমকূপে
নিক্তিতে ওজন করে সমপরিমাণ বিশল্যকরণী
তুমি তুলে রাখবে, ভেবেছিলাম, তোমার চোখের তারায়
হঠাৎ হাসিতে, আমি রোজ ফেরার পথে
কুড়িয়ে নিয়ে যাবো দিনের শেষে, এই বিশ্বাসে
এতদিন সব কিছু তুচ্ছ করেছি আজ শীতের বিকেলে
রোদ্দুর হেলে পড়েছে আমার পায়ের উপর
দুচারটে শুকনো পাতা আকাশের ডাল থেকে
ঝরে পড়ছে আমার মাথায়, তুমি ব্যস্ত হয়ে থাকো
কাজ কর্মে উলবোনায়
আমি ঠিকানা কাটা বাতিল চিঠির মত
পড়ে থাকি তোমার চৌকাঠে, তুমি ছুঁয়েও দেখোনা,
আমি তো তোমার বৃষ্টি চাই নি, কেবলমাত্র
দু এক ফোঁটা শিশির চেয়েছিলাম,
আকাশ প্রদীপের নিচে একরাশ হেমন্তের পোকার মতো
আমার সব শব্দ, অভিমান, কাগজের কুচি পড়ে থাকে
ইতিহাসের রাণীর মতো বিখ্যাত অলিন্দে তখন তুমি
অবহেলাভরে জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছো মৃত কলকাতা শহরের উপর
রাত যখন অনেক, তোমার ঘুমন্ত সন্তানের মত
আমার সমগ্র সম্ভাবনা, সমস্ত ইচ্ছা আর কল্পনা
চুপ করে আছে তোমার স্পর্শের জন্য, যখন উসখুস ঘুমে
তুমি তোমার পুরুষকে জড়িয়ে ধরো, তখন সেই মাঝরাতে
টুকটুক করে কে যেন তোমার কড়া নাড়ে, তুমি জানো?
আমি আজ ভেঙে ফেলেছি সব পুরোনো ছক
সমস্ত পাণ্ডুলিপির মাঝখানে এনে বসিয়েছি তোমাকে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙগাতের উড়ন্ত ডানায়,
সবচেয়ে সুন্দর নদীর পারে,
আমার সব ভালোমন্দ পবিত্র দুঃখের মাঝখানটিতে
চিরকালের জন্য বসিয়েছি তোমাকে, এনে দিয়েছি
আমার সব অক্ষমতা আর প্রার্থনা, পৃথিবীর সব সুন্দর,
তোমার রাঙা আচলে বেঁধে দিয়েছি স্বর্গের চাবি,
আমি তোমাকে জরাহীন করেছি, মৃত্যুহীন,
আর তোমার পায়ের কাছে প্রতিদিন তিলে তিলে
ক্ষয়ে যাচ্ছি তোমার চটির মত,
অথচ আর কে আমার থেকে বেশি তোমাকে ভালোবাসতে পারে
কে জানে তোমার প্রত্যেক ভঙ্গির স্বর্গীয় অনুবাদ
তোমার নিয়ম শৃঙ্খল, তোমার নিজস্ব গণ্ডি ভেঙে
আমাকে একদিনও দিলে না একটা হঠাৎ ছুটি
'বললে না, আজ তোর উৎসব'
একটা পুরোদিন পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিতাম স্বাধীনতা,
ফিরিয়ে দিতাম সব অন্ধদের চোখ, সব হারিয়ে যাওয়া মানুষ
গান গাইতে গাইতে ফিরে আসতো তাদের মায়ের কাছে,
সেইদিন পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু শৈলাবাসে
মেঘের পর্দা ঘেরা বারান্দায় বৃষ্টির ঘুঙুর শুনতে শুনতে
সাদা রহস্যময় কাঠের বাংলো বারান্দায়
ম্যাগ্নোলিয়া ছুঁয়ে থাকাতো আমাদের, কখনো ঠাণ্ডা হবে না,
এমন কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে তুমি হাসতে
আর আমি সারাদিন তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতাম
সেই বাংলোর ঠিকানা সেই হঠাৎ ছুটির দিনের তারিখ
কেউ জানবে না রাঙা, কোনদিন; কত অসম্ভবের বুক থেকেই
তো জন্মান্তরের সূর্যোদয় হয়,
তোমার বালিশে মাথা দেব বলে, একটি মাত্র চুমু বা
এক পশলা বৃষ্টির মত আদরে তোমাকে তছনছ
করে দেব বলে আরেকবার জন্ম নেওয়া,

ব্যর্থ শব্দের অঞ্জলি, আজ দিনশেষে
মিনি বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি একা
আমার চারিদিকে শীত, জুড়িয়ে আসছে আমার সময়
কম্পাসের মত আমার সমগ্র চৈতন্য তবু তোমার দিকে
তুমি এখন আমাকে তুচ্ছ করে একা একা উল কিনতে যাচ্ছো

মৃণাল দত্ত

কাক—১

সারাদিন, থেকে থেকে, কর্কশ গলায় ডাকে একটা কাক।
দেখতে পাই কাক বসে আছে
টেলিগ্রাফ খুঁটির মাথায়, পাশে স্তব্ধ নিমগাছ।

ওদিকে দক্ষিণ।

কেঁপে উঠি মৃত্যু ভয়ে, হুস্ হুস্ করি
ওড়ে না কিছুতে, ঠায় ব'সে থাকে কালো কাক—
ডাকে, থেকে থেকে, কর্কশ গলায়—কা-কা

ওদিকে দক্ষিণ, স্তব্ধ নিমগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে।

রানা চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণ ভারত সিরিজ

পক্ষীতীর্থের পথে

তুমি আমাকে দিলে বাতিঘর ছড়ানো ছিটানো টিলা
রুক্ষ মরু ভাঙা জাতীয় সড়ক চায়—
আমি অন্ধকার থেকে দু'হাত তুলে ছুটে যাচ্ছি
মানুষের দিকে, শংকরাচার্যের জন্ম ভিটের দিকে.....

তুমি আমাকে দিলে দক্ষিণী স্বরক্ষেপন
আর ওই কামাক্ষীদেবীর মন্দির থেকে বেরিয়ে আসা
মুণ্ডিত মস্তকের যুবতী রমণী, কান্তিভরম শাড়ী
পক্ষীতীর্থের পথে ফেলে আসা অষ্ট্রেলিয় দম্পতির
পর্যটন মানচিত্র, মৃত খড় ভর্তি কাঠবিড়ালীর স্মৃতি।

তুমি আমাকে দুইচোখে দিয়েছো ভাল লাগার
নিঃশর্ত মগ্নতা—
আমি গোপন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি স্বর্ণকুঠার
এখন আমি ছিন্ন করবো ঈশ্বরীয় বৃক্ষ সকল,
মানুষের জন্য লিখে রাখব, পক্ষীতীর্থের উঁচু সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে
গ্রীষ্মকালীন পিপাশার কথা, বালিয়াড়ীর দিকে উড়ে যাওয়া
ওই দুই পক্ষীর কথা, রেখে যাওয়া দু'একটি ছিন্ন পালক.....

সুব্রত রুদ্র

কার্ল মার্কসের 'জেনি'-কে নিয়ে অংশ অনুবাদ

সমস্ত লাইনে শুধু 'জেনি' লিখে
আমি হাজার কপি বই ভরিয়ে দিতে পারি।
তবু শব্দগুলি হবে অপ্রকাশিত চিন্তার ভূমি...
দূরে নক্ষত্রবীথির দিকে চেয়ে
আমি এসব পড়তে পারি।

বসন্ত বাতাসের কাছ থেকে বিদ্যুতবেগে
সে আমার কাছে ফিরে আসে

এই একরকম কবিতা আমি লিখি।
আমি চাই আগামী শতাব্দী অনুভব করুক
ভালোবাসার নাম 'জেনি'
জেনিই ভালোবাসা।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

যা হচ্ছে হোক

যা হচ্ছে হোক, আমি মুখ
খুলবো না; এই
অন্ধতার সাম্রাজ্যে
কে কার ডালপালার ছায়ায় মাথা
রাখবে?
উশকো খুশকো চুলে হাত রেখে বলবে—এই তো
আছি, তুমি—
একা নও! তুমি—
আমার ছায়ায় দাঁড়াও; ওই তারাদের
ছাখো; ওই
হাঁটতে থাকা মানুষগুলোকে
ছাখো; ওদের
ভাষা তোমার জানা, ইংগিতও

কে বলবে? কই তাড়াখাওয়া ভেড়ার পালে
নেকড়ে পড়লে কেউই
বাঁচাতে আসবে না; যে যার
মুখের গ্রাস সামলে ছুটছে যেমন, তেমনিই
ছুটতে থাকবে; এই—
ব্যক্তিগত অন্ধতা পাহাড় জুড়ে উড়তে থাকা কুয়াশা
ধীরে ধীরে জানালা টপকে ঘরে, দরজা টপকে
মেঝে, ঢুকে
পড়ে, গ্রাস
করে

সারাটা ঘর দেশ আর মাটি, মানুষের
দৃষ্টি; একহাত দূরের জিনিষও
দেখতে পায়না তখন

যা হচ্ছে হোক, যে যার মাকু টানতে থাকো, তাঁতে
কাপড়বোনো রঙিন সুতোয়, নকসা ফোটাও
দিনগুলো যা কোরে হোক ফেটে যাবেই

দেখতে যে পায় দুঃখ তার পায়ে পায়ে, তুমি
অন্ধ হও, এই
সমতলে চড়তে থাকো জাবনা কেটে; মুখ
খুলবে না, মুখ—
খুললেই চিবনো ঘাস ছিটকে পড়বে;
চোখ খুলবে না, চোখ
খুললেই
অনেকটা দূর দেখতে পাবে, তাতে—
দুঃখ বাড়বে, তাতে—
দুঃখ বাড়ে

পূর্জটি চন্দ

চিত্রমলো / ১

একটা স্বপ্ন। অন্ধকারের নদী। তার মধ্যে উজানে ভাসছে দুঃখ।
মাঝি নেই। স্বয়ংক্রিয় নৌকো, আর দূরে, বলা যায় স্বপ্নের দূরত্বে
একটা সবুজ সবুজ ছেলে ডাং খেলছে।
আমি এই ছবি আঁকতে পারি না।

হঠাৎই বে-আক্কেলে হাওয়া বইল উল্টোদিকে
অভিমানী নৌকো ছুটল ঐ সবুজের দিকে—
তখন
ডাঙ্গায় বাঁধা ভোর, স্বপ্ন
যাই-যাই করছে।

কাছে যেতেই দেখলুম, এক অনতিশয় বালক
যন্ত্রণায় পেটে হাত দিয়ে কাৎরাচ্ছে
চোখে তার নিশিন্দে পাতার ছায়া।
সামনে উর্ণনাভ সময়,
শাশ্বতকালীন রোমান্টিকতায় রক্তের দাগ।

আমি এই ছবি আঁকতে পারি না।

রবীন সুর

সকাল

অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দে ঘুম ভাঙার আগেই
চিলবাচ্ছার চ্যাঁচানিতে ভোর তোলপাড়।
কোত্থেকে এক মা-চিল
বাসা বেঁধেছে তালগাছের মাথায়,
সারাদিন চারপাশে ওড়াওড়ি—
কাকের উৎপাত!
বারান্দার দক্ষিণে পাঁচিল ঘেঁষে সজনের ঝোপে
তিরতির করে উঠছে মাছরাঙা,
জানি না আজ বাজারে,
মাছের টুকরো কত করে,
পঁচিশ না ছাব্বিশ?
ধোয়াহীন কয়লা গুল ছড়িয়ে
সমস্ত সকালটা ধোঁয়ায় ধোয়ায়
ঝাপসা করে দিয়ে যাচ্ছে।
খাটালের খাঁটি দুধে
এতক্ষণ এঁদো পচাপুকুরের জল
মিশতে আরম্ভ করেছে,
বাসি পাঁউরুটি জায়গা পাল্টে
শো-কেসের সামনে এগিয়ে এসেছে
আর
পৃথিবীর সমস্ত ভুল খবর নিয়ে
সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে
নিউজপ্রিন্টের ধোকা ছড়িয়ে
সংবাদ পত্রের হকার।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রাস্তার গহীনে রাস্তা

বিধান সরণি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একদিন শান্ত এক মহিলাকে দেখে চমকে উঠি, 'এই তো আমার মা। বহুদিন দেখা হয়নি। তাই তাঁকে আত্মপরিচয় দিয়ে আমি বলি, 'আমি নিরঞ্জন।' মহিলা চমকান কম না। নিরঞ্জনকে চিনতে ভারি হিমসিম খান।

অন্যদিন দেশপ্রিয় পার্কে এক শাদা চুল বৃদ্ধকে দেখেই ডেকে উঠি, 'এই যে বাবা, এই যে আমি, তোমার ভুবন।' ভুবনবিস্মৃত তিনি মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ। তারপর বিড় বিড় করেন, 'এ নামে আমার কোন ছেলে নেই।

গোপনে রাস্তাকে আমি বড় একটা গাছের ছায়ায় ডেকে আনি, 'একী হল। আমার বাবা ও মা আমাকে চেনে না?' রাস্তাও গম্ভীর হয়। বলে, 'ওরা তো জানে না ওদের পরিচয়। আটকে আছে এইসব বাড়ি আর পার্কের ভেতরে। কেউবা খেদীর মা, কেউবা পাঁচুর বাবা হয়ে।'

আমার ভেতরে এক কষ্ট জেগে ওঠে, পৃথিবীর মা-বাবারা মরে যাবে একদিন এরকম মিথ্যে পরিচয়ে? রাস্তারও নিঃশ্বাসে কষ্ট। তারও বুঝি পরিচয় স্পষ্ট হয় না মানুষের দেওয়া কিছু নামে। তারও বুঝি আটকে যাওয়া আছে, মোহটোহ, সাংসারিক ক্ষুদ্রতা নাটমন্দিরের ঘোরপ্যাঁচ।

'এসো নিরঞ্জন, এসো হে ভুবন' বলে সে আমাকে ডাকে' 'এসো, এসো, পা চালাও। এখানে থাকলে আমি বিধান সরণি, ওখানে থাকলেও অন্য নাম। তুমিও আটকে যাবে কোনো এক মা-বাবার পাঁচু কিবা সাতকড়ি হয়ে। এসো, এসো পা চালাও।'

রাস্তার গহীনে রাস্তা নড়েচড়ে ওঠে। আমার শরীর থেকে যাবতীয় পরিচয় খসে পড়ে যায়। আমি দূর দিগন্তের রেখা দেখতে পাই। পোড়ো বাড়ি, পোড়ো রাস্তা, পোড়ো ঘর, পোড়ো কিছু মানুষের অধিকারে থাকে।

উত্তম দাশ

দৃশ্যের ভেতরে

দৃশ্যের ভেতরে যাবার জন্যে একটা উসখুসানি
যেন সিনেমা প্রজেক্টারে ছবি আসছে
কিন্তু কোত্থেকে আসছে সেই জানার জন্য অপেক্ষা
বালক বয়সের এই সব কৌতূহল
সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে
শরীর জানার কৌতূহল যেমন একদিন
অনেক কৌশল শিখিয়েছিল
কিন্তু শেষ জানা বলে কিছু কি আছে
পৃথিবীর তাবৎ দর্শনে তো অনেক ভাঙচুর হলো
আমরা কি কিছু দেখতে শিখেছি

দৃশ্যের ভেতরে গেলে
সত্যিই কি অন্য দৃশ্য দেখা যায়
অন্য দৃশ্যের ভেতরে আর একটা
আর একটার ভেতরে আর একটা

অজয় সেন

মন্দাক্রান্তা

শেষ দুপুরের ছায়ার থেকেও বড় হয়ে উঠলো তোমার অবিশ্বাস ;
সহসা মন্দাক্রান্তা নদীতে এল জলোচ্ছ্বাস, হাঁ গিলে নিলো জীবন
যাপনের বিশ্বাস ও শর্তাবলী ;
মধ্যরাতে কাঠের গরাদে মুখ চেপে ভাবো তোমার মিথ্যা
অহংকারের ভ্রান্তিময় ঔজ্জ্বল্য—যার ছোঁয়ায়
হয়েছো আরো বেশী দুঃখী ও একাকী এই তিরাশীতে

মানুষের সমাজে থাকে মানুষ,
অবিশ্বাসী কীট কখন যেন নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে সেখানে,
শুরু হয় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও মেঘ গর্জন,
দ্যাখো, হিংসুটে ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছে তোমার বিজ্ঞাপনের
সংসার ও কাজললতা ।।

অজয় সেন

সাড়া

যাকে ডেকেছো, সে দিয়েছে সাড়া, এই অবেলায়।
উদব্যাস্ত চৈত্রের বাতাস শেষে—সে তোমার ডাক শুনেছে ;
সারারাত পাতার মর্মরে, জোৎস্নার জাফরিতে তার জন্য মেপে
রেখেছো গোলাবাড়ীর ধান।
স্মৃতির ভিতরে প্রিয় শীতের বাগানে
তোমার শৈশবের সংগে মিলিয়ে দিলে রং, কাঠের দোলনা,
গরম পশম।
রক্তের মধ্যে সহসা উঠে আসে তোমার বুকের কাছে,
ফিস্‌ফিসিয়ে সাড়া দেয়—যাই—যাচ্ছি ।।

রথীন্দ্র মজুমদার

কতকাল

ঘর অন্ধকার ক'রে শুয়ে থাকি
হারানো স্বপ্ন আর আমি
দিন যায়, রাত আসে আবার দিন যায়
বইয়ের পাতা আমায় ডাকে; এসো, এসো
তাকাই না, দেখিনা, শুয়ে থাকি বিছানায়
কবিতার খাতা ছিঁড়ে ফেলেছি, ভাসিয়ে দিয়েছি জলে
তোমার সঙ্গে দেখা হয় না কতকাল
খরার পর বৃষ্টি এলো, চলে গেলো, শীত আসছে আবার
ফুলের গন্ধ পাইনা কতকাল
অন্ধকার শুধু অন্ধকার
রাত, কত দূরের রাত

ঘরের ছায়া নেই, ঘরের কোনো স্পর্শ নেই, স্তব্ধতা
জানলার পর্দা কাঁপে, বাতাস
বন্ধ দরজায় কার হাতের ডাক
ছড়ানো শিশির, হাহাকার
শুকনো ঝরা পাতা, কবে জেগে উঠবো, কতকাল!

মনুজেশ মিত্র

ভাঙনের কথা

আহা তুমি ভাঙনের কথা বলো, বলে যাও—
নদীর দুহাত ধরে আমি
পারে বসে আছি,
নদী খলখল হাসে.....
হাসি? নাকি পরিহাস?
নৌকা তো প্রস্তুত।
তবু এ কেমন যাওয়া!
সব কিছু ক্ষয়ে যাওয়া মাটি,
তাই নিয়ে
কাঁকড়ার মতন আঁকড়ে ধরে!
নদী হাসে পরিহাসে—
থাকবে না সে, নদী জানে,
পার থাকবে না—
শুধু বালিয়াড়ি···
সেখানে বসবে নাকি মাঠ?
ক্ষেত-জমি? তৈরী হবে বীজের আঁতুড়?
নাকি এক সহিষ্ণু প্রদীপ
জ্বলে থাকবে শুধু বলে দিতে—
এইখানে একদিন আমরা ছিলাম।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

যদি চাও

ভালোবাসা আর দুঃখ খুব কাছাকাছি
যদি ভালোবাসা চাও তবে দুঃখকেও নিতে হবে
ছায়ার মতোন দুঃখ সরে সরে আসে
যদি দুঃখ চাও শুধু, তবে আমি ভালোও বেসেছি
ভালোবাসা আর দুঃখ খুব কাছাকাছি
তোমার দুচোখে সুখ—সুখ নয় রূপোলী ঝিলিক
বুকের গোপনে দুঃখ জমে ওঠে নীল ব্যথাময়
তুমি কি বোঝ না, চোখের আড়ালে কেউ
দুই হাত পেতে আছে ব্যথার গরল নেবে বলে
যদি চাও ভালোবাসা, বাঁধভাঙা বুকে
দেখো এক শতদল দুঃখের গৌরবে ফুটে আছে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

জ্যোৎস্নায় ঘুমাও না

স্বপ্নের মধ্যে এক একদিন কে যেন
দুরন্ত প্রহর আনে
জাগরণে সূর্যোকরোজ্জ্বল আশ্বাস,
এক একদিন মুহূর্তের গণ্ডী ছিঁড়ে
রক্ত নাচে সবুজের স্নেহে
নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ে
ঘোরে ফেরে
হাওয়া কানে কানে
বলে যায়, জ্যোৎস্নায় ঘুমাও না
ভিতর বাহির
খুলে রাখো, দ্যাখো চেয়ে
তোমাদের আগামী সকাল
আরো আলো দেবে বলে বিকশিত
থরো থরো মাটি কাঁপে, কান পাতো
সবুজের বুকে
মায়ের দু'চোখে স্নেহ, হাওয়ায় আশ্বাস
জন্মভূমি স্বর্গাদপি
গরিয়সী আমার স্বদেশ ॥

বাসব দাশগুপ্ত

নির্জনবাস

এক পা এগোলে — একরাশ নদী
অসীম আকাশ — পীত কিশলয়
হাতটা বাড়ালে — ঢল ঢল জল
বিশাল পাথর — টুকরো জাহাজ
আমার সামনে — এখন এমন
সাজানো গোজানো — দৃশ্য ছড়ানো।
মাতাল নাবিক — মদ খেয়েছিল
বোতল টুকরো — এখন ছড়ানো
এখান থেকেই — প্রতিদিন রাতে
এইসব স্মৃতি — বিষ মনে হয়।
এখন আমার — একা লাগে খুব
কেউ তো থাকেনা — এই ভূমি পড়ে,
থাকে শুধু নদী — উজ্জ্বল মাছ
ধবধবে সাদা — জাহাজী পতাকা।
তোমাকেই বলি — পথে যে যাচ্ছ
এখানে আমার — বড় একা লাগে,
যে দিকে তাকাই — ছড়ানো রয়েছে
ঝিক ঝিকে বালি — আর ঝরা পাতা,
তুমি যদি আস — একটু দাঁড়াও
বড় ভাললাগে — বড় ভাললাগে।

মলয় সিংহ

একটি কবিতা

(মৌ-কে)

যখনই ফিরে আসি এই কমলা আলোয় তখন তোমাকে
স্থির, কোন এক রাজকন্যা বারবার মনে আসে।
আমি রাজা নই, অথবা ঈশ্বরের স্তাবক নই, শুধু পুরুষ প্রতীক
কামনা বাসনার মাঝে দম্ভ করে জেনেছি নারী ও নদী।
তুমি মন্দিরের কথা বলেছো
আমার ভাল্লাগে না, তুমি পারিজাতের কথা বলতে বলেছি,গন্ধ নেই,
উদাসীন চাউনিতে নিজেকে দগ্ধ করেছো বারবার।
আর আমি ? তোমাকে কাজল মাখিয়ে দেখাতে চেয়েছি পৃথিবীর রঙ;
ভালোবাসা।

হান্নান আহসান

বেড়ে উঠলে

এভাবেই সবকিছু শেষ হয় সবকিছু তিলে তিলে
খরস্রোতা নদীর মতো অহংকারী শব্দের জৌলুস
সময়াচিত বুকের ভিতরে নীলতারা বেবাক প্রত্যয়।

বিষাদ-বিষণ্ন ঘেরা শরীর জুড়ে জমাট রক্ত
আজীবন খেলা করে উচ্চাশার দীপ্ত প্রহরে
সঘন বাস্তবতার সাথে আষ্টেপৃষ্টে অকল্পনীয় যৌবন।

এভাবেই যদি বেড়ে ওঠে কিছু ডমরুল-নটেরা
সবকিছু হয়ে যায় স্বপ্নের মতো ধোঁয়াটে সকাল
চড়া শব্দ বেসুরো গলায় ঠিক ঠিক বেজে উঠলে।

কবি আনন্দ বাগচী সম্পর্কে ; কয়েকটি মগ্ন উচ্চারণ

কৃষ্ণা বসু

কবিতার কাছে মানুষ কী চায় ? শোকের সান্ত্বনা ? আনন্দের প্রতিধ্বনি ? নিঃসঙ্গতায় সঙ্গ ? মুগ্ধতার সমর্থন ? উপলব্ধির সত্য ? নিখুঁত ছবি ? মানুষের জন্য মানুষের বুকের তলায় জমিয়ে রাখা ভালোবাসা ? জীবনের তিক্ত কষায় কিম্বা সূক্ষ্ম সুকুমার সব মুহূর্তের প্রতিবিম্ব ?—বোধহয় কোন একটা নয়, সবটাই তার অর্থাৎ পাঠকের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রয়ে গেছে। এক এক কবিতার ক্ষেত্রে এক এক রকম চাওয়া। এক কবি সমস্ত রকমের-ই কবিতা লিখতে পারেন না, কবিতা যেমন অনেক রকম কবিও তো তেমনি অনেক রকমেরই ; এই সত্যটুকু মেধায় বিধিয়ে রাখা আমাদের দরকার। যাঁর কাছ থেকে যতটুকু পাই তার গভীর পর্যন্ত যেন পাঠিয়ে দিতে পারি অন্তর্ভেদী রঞ্জন রশ্মির দৃষ্টি, দেখে নিতে পারি তা এ ফোঁড় ও ফোঁড়, চিনে নিতে পারি তিনি কোনখানে সফল কোনখানে তাঁর কণ্ঠস্বরে সবচেয়ে গভীর করে কিছু শোনা যায়, কোন্ প্রান্তে তিনি ছুঁয়ে আছেন আমাদের মানুষের মানুষীর জীবন। কবি আনন্দ বাগচী সম্পর্কে কিছু আজ এখানে লেখার জন্য এই ভূমিকা, অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে। পূর্ববর্তী পাঠের স্মৃতিতে যা আছে গ্রথিত হয়ে এবং আজ এই মুহূর্তে যা রয়েছে আমার কাছে সেই সব কবিতাগুলিতে তাঁর জীবনের প্রতি মায়া, ছবি আঁকবার ক্ষমতা, জটিল এই আজকের জীবনের বহু মাত্রিক ব্যাপার স্যাপারকে ছুঁয়ে যাবার মেধা ; কোথাও বা তাঁর কবিতা ঝুঁকে আছে রহস্যের দিকে, কোনোখানে হয়তো বা তা উঠে এসেছে প্রাত্যহিক জীবনের নোনাগন্ধে, মাছের থলিতে, পিক আওয়ারের আগে গরম সিদ্ধ ভাতের গন্ধে অফিস যাবার বাবু ব্যস্ততায়, কোন জায়গায় গাঁ গঞ্জের সাধারণ মানুষের জীবনের গন্ধে ঘামে স্বপ্নে ঃ—এই রকম বহুতল বিচিত্রতাই তাঁর কবিতার প্রধান আকর্ষণ আমার কাছে। কোথাও তাঁর কণ্ঠস্বরে নাগরিক শ্লেষ কোথাও মাটির টানের মতো মমতা কোথাও মন-কেমন-করার নষ্ট্যালজিক আতুরতা,—তাঁর স্বর ও বক্তব্যের বিচিত্রতা অনুসারে বহু রকম ভাবে ধরা পড়ে মনস্ক পাঠকের কানে। স্বল্প বাক্ শ্রদ্ধেয় এই মানুষটি নিজের সম্পর্কে একেবারে নীরব, পরিণত এই কবি ব্যক্তিত্বটি সম্বন্ধে কিছু শ্রাদ্ধেত উচ্চারণের সময় নিশ্চয়ই এতদিনে হয়েছে ; আগেই উচিত ছিল কোন পত্রিকার কিছু গভীর ব্যাপক আলোচনায় মগ্ন হবার। এরকম কয়েকজন অগ্রজ এবং অগ্রজা কবি আছেন যাঁদের সম্পর্কে অনুজ কবিদের সাহিত্য-সম্পর্কিত মানুষ জনদের কিছু দায়, শ্রদ্ধার দায়, রয়ে গেছে

সত্যবদ্ধ উচ্চারণের ভঙ্গিতে। তবে কিনা চারিপাশের বহুমুখী দর্পণে নিরন্তর চেষ্টা চলছে নিজেকে শুধু নিজেকেই বহুভাবে প্রতিফলিত করার, উচ্চকিত করার তার বিপুল কোলাহলে এইসব দায় আমরা বিস্মৃত হয়ে তুমুল নার্সিসাস হয়েই তো আছি।

আমার জানা নেই, হয়তো অন্যে জানেন যে বাংলা ভাষায় কাব্যোপন্যাস আরো আছে কিনা, মধ্য যুগের পুরোনো সিন্দুকে মঙ্গলকাব্যের বাদামী পাণ্ডুলিপি বাদ দিলে, আজকের কালে প্রকৃত অর্থে কাব্যোপন্যাস বোধহয় নেই। থাকলেও একটি দুটির বেশি নিশ্চয়ই নেই। এই কবির কাব্যোপন্যাস 'স্বকাল-পুরুষ—সম্পর্কে দু'চার কথা প্রথমেই বলব, বলব কেননা এখানে কবি আনন্দ বাগচীকে অনেকখানি পেয়ে যাই, আবার যে মানুষটি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস গল্প লেখেন, মানুষের চরিত্রের মর্মভেদ করেই লেখেন; আজকের জীবনের নোনা রক্ত ঘাম, বিশ্বাস ও বিশ্বাসহীনতা, ভণ্ডামি ও সততার কথা লেখেন রীতিমত মুন্সিয়ানার সঙ্গে,—সেই লেখকটিকেও পেয়ে যাই এই 'স্বকাল পুরুষ' কাব্যোপন্যাসটিতে। গদ্যের জন্য আমাদের অস্তিত্বে এক ধরনের ক্ষিদে থাকে আর কবিতার জন্য আকণ্ঠ তৃষ্ণা, কাব্যোপন্যাসে এই দু'টিই মেটে। আর যেহেতু এই লেখাটির উপজীব্য অনুভূতিশীল কিছু তরুণ তরুণীর বেদনা নিঃসঙ্গতা আহত বিশ্বাস কিংবা রক্তাক্ত ভালোবাসা, তাই এর পরিবেশন পাত্র কবিতা আর একথা কেনা জানে যে কবিতা এই সূক্ষ্মতর অনুভূতিগুলির যোগ্যতর বাহন, যোগ্যতম বোধহয় সংগীত। জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে অন্বিত হয়ে আছে মরণ। 'মরণ' এই তিন অক্ষরের শব্দটি কী ভয়ঙ্কর অথচ কত স্বাভাবিক। কবি আনন্দ বাগচী তাঁর এই কাব্যোপন্যাসে সেই মৃত্যুর অনুষঙ্গে কবিতার ভাষায় বলেছেন :

'প্রিয় পতনের শব্দ মাঝে মাঝে হয় এই স্তব্ধ পৃথিবীতে
যত ভালোবাসো তুমি পদ্ম পাতা টলমল করে
শোবার ঘরের মধ্যে হাসপাতালের গন্ধ কাঁপে।"

প্রিয় পতনের শব্দ কিংবা শোবার ঘরে হাসপাতালের গন্ধ,—এইখানেই এই চমৎকার প্রয়োগেই উপন্যাসকে ছাড়িয়ে ওঠে কবিতা। আর একজন সৎ কবি যখন তাঁর কাব্যোপন্যাসের মধ্যে এই ধরনের পংক্তি শোনান তখন উপন্যাসের ক্ষুধা অতিক্রম করে কবিতার শুদ্ধিতেই পৌঁছে যাই আমরা।

তীক্ষ্ণ চোখে দেখা তাঁর পর্যবেক্ষণকে এই কবি জমিয়ে রেখেছেন স্মৃতিতে আর তাঁর রচনায় ফলে উঠেছে অজস্র কারুকার্যময় নিখুঁত ছবি। এই চিত্রলতা

বর্ণনার এই ঐশ্বর্য এই অতিরিক্ত লাভ আমাদের অর্থাৎ পাঠকদের। অজস্র উদাহরণ নিয়ে জলজল করছে এই ক্ষমতাটি বিভিন্ন কবিতায় এবং কাব্যোপন্যাসটির বহু পাতায়। মৃত্যুর আঘাতে বিধ্বস্ত কটি সন্ধ্যার ছবি পেয়ে যাই এই স্বকাল-পুরুষেই

"আকাশে গলন্ত চাঁদ দেখাদিল, দক্ষিণ সমীরে
সমুদ্রের স্বর যেন ফিরে আসছে চৌরঙ্গীর মাঠে
ঘন শিরিষের ছায়া, বায়ুভুক জন সাধারণ
ছায়ামূর্তি ফেরিওয়ালা, নিবিড় নিবিড় নিদ্রার মত ঝিঁঝিঁ
ঘাসের নৈপথ্যলোকে ডাক পাঠায়, চুমকির চমকে
উজ্জ্বল আলোর থৈ আচমকা ছড়ায় জোনাকিরা
হলনা দ্বিতীয় কথা, অদ্বিতীয় শোকের স্মৃতিতে
ঝুপসী হয়ে বসে থেকে উঠে গেল রাত ঘন হলে।"

ছবির এই অজস্রতা আনন্দ বাগচীর কবিতায় সর্বত্র মুঠো ভরে কুড়িয়ে নেওয়া যায়, কারুকাজগুলিও লক্ষ করার মতো। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত আজ থেকে প্রায় বাইশ তেইশ বছর আগের সেই তরুণতর কবির কাব্য 'তেপান্তর'—তাতেও এই চিত্রলতার পরিচয় সমূহ ফুটে রয়েছে :

"গোলদীঘি ভরে জলছে বাঁকা চাঁদের একশো ঢেউ ছবি
টিমটিমে আলোয় ধুঁকছে ফাঁকা গলি
ইউনিভার্সিটি অন্ধকার
সমস্ত দোকান বন্ধ বই ছড়ানো ফুট পাথে এখন
ছেঁড়া কাগজের টুকরো দমকা বাতাসে ভেসে ফেরে
শ্বাপদের নখ বাজছে রোয়াঁ ওঠা ডিগ ডিগে কুকুর
কানা ভিখিরীটা শুয়ে, চাপা কলে অস্পষ্ট উথলান
জল হোক ঘোলা জল তবু বুক ভাসছে অ্যাসফল্টে গ্রানিটে
স্নেহ ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা আলগা টিপকল থেকে
বারোটা রাত্তিরে
ট্রাম নেই বাস নেই, কোলকাতার দেয়ালে দেয়ালে
কাঁচা পোষ্টারের বুকে জেগে আছে নট নটীর মুখ"

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল, উপায়ান্তর নেই, রাত্রি বারোটায় কোলকাতার এক অতি পরিচিত অঞ্চলের যে অপরিচিত ছবি এখানে যত্নে বিন্যস্ত, তার পুরোটাই পাঠকের সামনে উপস্থিত করার লোভ জেগে উঠল। এই রকমই ছবি বহু

কবিতাকে পাঠক পাঠিকার হৃদয়ে সরাসরি পৌঁছে দেবার সেতুর কাজ করেছে। এই কবির কবিতা সম্পর্কে ও এই সরল কথাটি সত্য যে এঁর কবিতার কোনো ভাণ নেই, মগ্নতা আছে, নিষ্ঠা আছে যাতে পাঠকের সঙ্গে কবিতার সোনার সেতু গড়ে তোলে। এঁর কবিতা পড়বার পরে দুর্বোধ্যতার অভিযোগে পাঠকের ভ্রূ কুঞ্চিত হয় না অথচ সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত আধুনিক ও বটে।

কবিরা তুমুল প্রেমিক হয়, জীবনের প্রতি প্রেম, সৌন্দর্যের প্রতি প্রেম, ভালোবাসার প্রতি ভালোবাসায় কবিরা মাতাল। কবিতাতেও ভালোবাসার সেই তীব্রতা রক্ত মাংসের মানুষের আশা কান্না বেদনাকে প্রেম অপ্রেমকে গভীরতর স্থাপত্য করে তোলে। এখন যখন স্থূল অর্থে 'ধর্ম' নামক বস্তুটি অনুপস্থিত আজকের জীবনে, যখন ঈশ্বরও নির্বাসিত-প্রায় যখন কোন সামগ্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ নয় সকল মানুষ অনেক কিছু হারিয়ে ফেলার এই যুগে প্রেমই সবচেয়ে প্রবল প্রভু হয়ে দেখা দেয় কবিতায়, আর বোধহয় প্রেমেরই প্রবল প্রতাপী যে প্রেম তার সত্য সংরাগী কণ্ঠে 'স্বকাল পুরুষের' নায়ক আমাদের শুনিয়েছেন,—

"শর্মিলা, শর্মিলা তুমি রাজধানীর প্রেতাত্মার মত
আজ আমাকে ভালোবাসছ, ভালোবাসা ক্ষুধিত পাষাণ
টানে, বুকে টানে, পাক যন্ত্রে টানে ভালোবাসা এমন যন্ত্রণা
সমস্ত ইন্দ্রিয় টানে ; রাণীবালা ; ভালোবাসা অসুখের মত
সমস্ত নিঃশ্বাস শুষে সব খুশি আনন্দ ভরসা
শুষে নেয়, আলো অন্ধকার থেকে অন্ধকার আলো
থেকে, সব থেকে, এই দেহ থেকে দেহান্তর থেকে।
দুর্বল অস্থির করে ভালোবাসা, দুর্বল গোড়ালি
ভর দিয়ে পৃথিবীতে রুগ্নতম হেঁটে ফেরে চলা
ভালোবাসা। ভালোবাসা পদ্মপাতায় জল, ভালোবাসা।"

শুধু এখানেই নয়, ভালোবাসার এই সমস্ত অস্তিত্ব মন্থন করা স্পন্দন এর রক্তাক্ত পদচিহ্ন প্রকৃত কবির মত বহুবার বাজিয়েছেন কবিতায় তিনি—

"তুমি কি জানো না আমি তোমার প্রেমিক এই ভয়ঙ্কর অপরাহ্ণ বেলা
ধারালো কাচের মত ভাঙা টুকরো কলকাতা মাড়িয়ে
তোমার কাছেই শুধু ছুটে আসছি শেষ রৌদ্রে করুণ বেহালা"

কাব্য সমালোচনার আদিকালে দেখেছি 'imagery' র কোন ভূমিকাই স্বীকার করা হয়নি। সুপ্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা, গ্রীক পণ্ডিতেরা এমন প্রতীতি

করতেন যে অলংকারই কাব্যের একমাত্র ঐশ্বর্য। আজকের সমালোচকরা পুরোনো দিনের মতের সবকিছু স্বীকার করেও একটি নতুন জিনিষ যোগ করেছেন এবং সেই নতুন জিনিষটিই বড় দামী জিনিষ, তা হল কাব্যের প্রাণ নিহিত রয়েছে imagery তেই। ভাব ভাষা আর ছন্দ এই তিন ঠিক ঠিক মিললে অপরূপ imagery তে, তবেই অনির্বচনীয়তা জেগে ওঠে, ধরা দেয় রস। এই imagery-র ঐশ্বর্য কার কতটা তা কাব্য ভাবনার সময় অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। মালার্মে একবার জনৈক চিত্রকর-কবিকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে—"You don't write poems with ideas my dear Degas but with words" সেই শব্দের ঐশ্বর্যও এই কবির ভাণ্ডারে বড় কম নেই, অনাবরণ সহজ সুন্দর শব্দ কোথাও বা মিনে করা গয়নার মতো রঙিন ঝকঝকে শব্দ সাধারণ লৌকিক শব্দ কবিতাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। উপমাই কবিতা এই বাক্যটি আজ কবিমহলে প্রবাদ প্রায় ; যাঁরা লেখালেখি করেন কিংবা কবিতার ঘনিষ্ঠ পাঠক তাঁরা জানেন শুধু উপমাই জীবনানন্দ দাশের মতো বড় কবির কবিতাকে কতখানি ঐশ্বর্য দান করেছিল। মাত্র একটি উপমাও কখনো গোটা কবিতাটিকে করে তুলতে পারে অপরূপা। কবি আনন্দ বাগচীর কলমে সুন্দর সুঠাম অন্তর্ভেদী সব উপমা ধরা পড়েছে ; চিত্রকল্পের ভাঁড়ারেও তাঁর পর্যাপ্ত ঋদ্ধি।

"সুগভীর বঙ্গদেশ দিনরাত এমন নির্জন
গণ্ডুষ জলের মতো স্থির স্বচ্ছ করতলগত"

কিংবা অন্যত্র—

"স্বপ্নের ভিতরে বুনো মুরগী নদী পিছল তরল
যুবতী নিকটে আসে অন্ধকার নির্ভুল নিয়মে
মাতাল ধানের গন্ধ চাষার শরীরে ফলে আছে

সমস্ত অরণ্যভূমে স্খলিত পাতার শব্দ হয়।"

অথবা অন্য আর একটি কবিতায়

"চিঠির বাক্সের মতো বিষণ্ণ বিজন ডাকঘর…"

অথবা

"সমস্ত জীবন যেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে এই ডাকবাংলোয় বসে থাকা"

কিংবা

"ধারালো কাচের মত ভাঙা টুকরো কলকাতা মাড়িয়ে…"

এইসব উপমা কিম্বা চিত্রকল্প গুলিই তো হাত ধরে নিয়ে যায় পাঠককে কবিতার দেশে।

নাগরিক জীবনের ভুল ক্লেদ বিবর্ণতা কতবার আলোড়িত করেছে তাঁকে তাই এক বিষণ্ণ দুঃখী অভিজ্ঞ মুখশ্রী দেখি এই কবিতাগুলিতে। নষ্ট কোলকাতা, ভ্রষ্ট কোলকাতা, অন্ধ কোলকাতা তাঁর কবিতায় কত ভাবে ফিরে ফিরে এসেছে। এই ধুলোর শহর, কালো ধোঁওয়ার শহর, ঝাপসা শহরে তাঁর কবিতা নানান অনুষঙ্গে ধরা দিয়েছে। কখনো বা নষ্ট্যালজিক অনুভবের টনটনে মনকেমন করায়, কখনো নির্নিমেষ অভিমানে, কোথাও শ্লেষে বা বিষাদে।

"গনগনে বিকেল বেলা চৌরঙ্গীর ধূর্ত বাস স্টপে
মানুষের ডাস্টবিন উপছে পড়ছে ভয়ঙ্কর বাঁক নিচ্ছে বাস
সবারই ভীষণ তাড়া বাড়ি ফিরবে মৃত্যু বড় নিকট এখন"

কিংবা

"চিৎপুরের চোরাগলি ঘাস চটা শ্রদ্ধানন্দ পার্ক
ক্লাইভ স্ট্রিটের চাঁদ, ছ্যাকড়া গাড়ী, ক্লান্ত কলুটোলা
অর্ধ শতাব্দীর সব স্মৃতি চিহ্ন ক্ষতচিহ্ন হয়ে
ইতস্তত ছেয়ে আছে, আহীর, বণিক পল্লী, নাথের বাগানে
বটতলায় পঞ্জিকায়, সোনায় সোহাগা হয়ে গরান হাটায়
মানুষের আতির্যক হেঁটে যাওয়া ; গঙ্গাস্নানে রমণী গোপনে
ব্যাধিগ্রস্ত ব্যবসায়ে, অন্ধকার অশ্লেষা মঘায়
নিষিদ্ধ নেশায় মজা ক্রীতদাস ক্রীতদাসী প্রেমে।"

এই রঙচটা, বিস্বাদ, বিচিত্র কোলকাতার পাশাপাশি নিজের তরুণতর স্মৃতির তুমুল কোলকাতাকেও কবিতায় ফিরিয়ে এনেছেন কোথাওবা। যে কোলকাতা মধ্য দুপুরে কলম পেষে, অফিস যাত্রীর জীবিকা সন্ধানীর ভীড়ে উপচে পড়ে বীভৎস ভাবে প্রায় রোজ দু'বেলা, সিগারেট ধরানোর দড়ির আগুনে জ্বলে, সেই কোলকাতা ও তাঁর কবিতার জমিতে জেগে উঠছে। গাঁ গঞ্জের গল্প, ধানের গন্ধে মাতাল কৃষকের গায়ের ঘ্রাণ, প্রাচীন পালকীর খোলা দরজায় কিংবদন্তী মুখ যতই তাঁর কবিতায় থাকুক না কেন আমার কেন জানি না মনে হয় এই কবি আগাগোড়া একজন নাগরিক কবি, এই নগরের মহানগরের দীর্ঘশ্বাস অভিশাপ যন্ত্রণার স্বগত সংলাপ এর প্রণয় এবং বিরহ এর জটিল গ্রন্থিল জীবন যাপনের—সব শুনেছেন তিনি

আর করুণা যা যে কোন সৃষ্টির মূল প্রেরণা আদিকালের বাল্মীকি থেকে আজকের কালের যে কোন সংবেদনশীল শিল্পীর ক্ষেত্রে যা চিরদিনের সত্য, সেই

করুণার মেঘলা মায়াবী মুখশ্রী অপলক কোথাও কোথাও দেখেছি এই কবির কবিতাতেও। 'কুরূপা' নাম্নী কবিতাটির কথাই মনে করা যাক্।

'বই এর পাতায় মুখ ঢেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখলে আজীবন' যে রূপহীনা তার বেদনার প্রতি, আপাত ব্যর্থতার প্রতি নিজের অনুভবকে সঞ্চারিত করে দেওয়া, কিম্বা সেও যে অন্ধকারে রাজরাজেশ্বরী হয়ে উঠতে পারে কখনো, এই উন্মোচন এই উপলব্ধি ঔপন্যাসিক আনন্দ বাগচীকে মনে করিয়ে দেয়। একথাও তো ভীষণ ভাবে সত্য যে আজ কবিতার বিষয় যে কোন কিছুই হতে পারে, আধুনিক কবির হাত এক অলীক পরশ মানিক যার প্রকৃত স্পর্শে তুচ্ছ ধাতু হয় হিরন্ময়।

"তোমার নির্জন শাড়ি ছিড়ে গেছে জীবিকা খাবায়
তোমাকে দেখেছি আমি জীবনের ভীড়ে ডুবে যেতে
আত্মার নিস্তব্ধ হাসি নিয়ে ম্লান মোমের মতন
তোমাকে দেখেছি আমি জীবনের ক্লান্তি ফিরে পেতে।"

এই অপহৃত যুগের কবি আনন্দ বাগচী। তার কবিতায় মানুষেরা মানুষীরা হৃদয়ের আর্তি ক্ষোভ নিয়েও পরস্পরের কাছে ব্যক্ত করতে পারে না তা। স্থির বসে থাকে অনুচ্চারিত অনুভূতি নিয়ে নির্বাচিত গাছের তলায় যেন নির্বাক যুগের সিনেমার নায়ক নায়িকা। তাঁর 'স্বকাল পুরুষ' কাব্যোপন্যাসেও নায়িকা সমাজের চোখে উদ্বৃত্ত নষ্ট নারী তবু তিলোত্তমা প্রেমিকা সে তার অনন্যোপায় মরণের, আত্মহননের মুখে এসে যখন বিষ ঢুকে গেছে অস্তিত্বে সেই গরলিত মুহূর্তে তার কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত পুরুষটি তার অমৃত নিখিলেশ ফিরে আসে, যেন বিদ্রূপের মতো, যখন ফিরে আসবার আর কোন অর্থ নেই তার কাছে। এই সেই নষ্ট যুগের আহত বিশ্বাসের কবি, যাঁর চরিত্র নিজের শুদ্ধির জন্য প্রকৃত প্রেমিকার কাছে গিয়ে নিজের পাপ ও পতনের কথা পণ্যা নারীকে ভোগের কথা বলে সততার সঙ্গে, প্রেমের সেই সকরুণ স্বীকারোক্তি অন্ধ নায়িকার মুখে 'ইতর' 'লম্পট' নামে অভিহিত হয়, এই সেই যুগ যখন অভিনয় মিথ্যাচার জিতে যায়, সৎ শুদ্ধ সমর্পণ ও স্বীকারোক্তি ঘৃণিত হয়, তার বেদনা মগ্ন মনোযোগের সঙ্গে এঁকেছেন স্বকাল পুরুষে।

ব্যক্তিগত আলাপ চারিতায় জানা যায় জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই দুই ভিন্ন স্বভাবের কবি তাঁর প্রিয়, আপাত ভাবে এই পরস্পর বিরুদ্ধ প্রীতির গভীরে এই কবির সম্পর্কে একটি সত্য উপলব্ধিতে বিঁধে যায় : সুধীন্দ্রনাথ

দত্তের কবিতার আঙ্গিকের যে আটো সাঁটো বাঁধন, সে ক্লাসিক শরীরের তলায় সংরাগী তীব্র রোমান্টিক অথচ অবিশ্বাসী সংশয়ী মন নিহিত সেইখানে এবং জীবনানন্দে যে গভীর সংক্রামক তন্ময়তার কথনো মগ্নতম বিষাদের, কখনো বা জীবনের উৎসবের উপজীব্য শিল্প পেয়ে যাই,—এই দুই মেরুর সঙ্গে আনন্দ বাগচীর কবি মানসের রয়েছে আপাত বিরুদ্ধ এক মিল, আপাত বিরুদ্ধ কিন্তু অন্তর ধর্মে সাযুজ্য যুক্ত, অন্বিত।

পঞ্চানন মাল্লাকর

শূন্যতা পুড়িয়ে

শূন্যতা জড়িয়ে পায়, মানুষেরা হেঁটে যেতে পারে।
মানুষেরা হেঁটে যায় কাকর বিছানো লাল পথে,
যে পথে ছিল না ঘাস, যে পথে পায়ের চিহ্ন নেই।
বিকেলের বাঁকা রোদ যে পথে ঠোঁটের ছোঁয়া রাখে।
যে পথে আমিও যাবো, বিস্মৃতির শূন্যতা উড়িয়ে
কিন্তু যাবার আগে দৃষ্টি ফেলে পিছন উঠোনে,
ছড়ানো ছিটোনো কিছু মুহূর্তের লুকোচুরি খেলা;
বাঁকানো গ্রীবায় খেলে অর্থ পূর্ণ আলোকের হাসি।
ম্লান রোদে প্রসারিত রাত্রি নামে শব্দহীন চোখে,
সন্ধ্যাতারা নেমে আসে শুদ্ধতায় শূন্যতা পুড়িয়ে।

নৃসিংহ মুরারি দে

এখানে বিলম্বিত সুখ চেতনা

এখানে ময়ূর দেখতে এসেছিল যারা
তারা কেউ কেউ ঘুঘু দেখে খুশী হয়ে
বাড়ী ফিরে গেছে
আবার অনেকে ময়ূরের খোঁজে
শামুকের লালা ভেজা স্লেলট্রাক দেখে
ময়ূরের ধারনা করেছে মনে মনে
আবার কয়েক জন
ময়ূরের পেখমের পালক এনেছিল
ময়ূর চিনবে বলে

ময়ূরের নাচ ময়ূরের কথা অথবা
সারাটা বাগান আর পাখী আর পাখী
যারা এসেছিল তারা সব চলে গেছে
ময়ূর দেখে নি

মৃণালকান্তি দাশ

সারাদিন শব্দের পিছনে

সারাদিন আজ আমি শব্দের পিছনে ঘুরেছি—
শব্দ আমাকে নিয়ে ছুটে গেছে
অরণ্যের দিকে
চিনিয়েছে দ্রোণফুল, নবীন ঘাসের গন্ধ,
গাছেদের ভাষা—
নক্ষত্র ফোটার শব্দে আমাদের চমক ভেঙেছে,
তারপর চলে গেছি পাহাড়ের নিচে !

বহুকাল আগে যেন এরকম স্বপ্ন
এক সারণির ভীরু বাঁক থেকে,
উঠে এসেছিল সাদা বুকের ভিতরে—
আজ কোন আলো লেগে
জেগেছে প্রতিমা !
তার ছায়া, মায়াময় স্পর্শটুকু
ধরে রাখি উদাসীন স্মৃতির পিরিচে !

রঞ্জন ভাদুড়ী

দুই প্রজন্ম

'কুকুর বেড়েছে খুব ইদানীং কলকাতা শহরে,
বিশেষত বর্ষাকালে যত্রতত্র যা কাণ্ড ঘটায়
চোখে দেখা যায় না সেসব—
ছোট ছোট ছেলেপুলে মা-বোনেরা পাশেই থাকেন—'

'তা যা বলেছেন—
মানুষও বেড়েছে যেন কুকুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে,
তার সঙ্গে মশামাছি নোংরা আবর্জনা,

রাস্তাঘাট খুঁড়ে খুঁড়ে হাল্লা করে দিচ্ছে সবাই !
এখন এখানে থাকা, চলাফেরা—নরকচারণ !'

এবংবিধ বাক্যালাপ করছিলেন বাসের দুজন
পাশাপাশি-বসে-থাকা প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

কাছাকাছি-বসে-থাকা দুই বালক
এ থেকে সিদ্ধান্তে আসে—বুড়ো হতে বাকি নেই আর
এঁদের। নতুবা কেন সব-কিছুই দেখেন খারাপ
এই সব মান্ধাতার বাপ ?

শোভন মহাপাত্র

ডানা

সন্ধিপথে বসেছিল, পাখি, ছোট ডানা
সে তখন সন্ধ্যাকাল, জীবন অচেনা
পুবালি দরজার মুখে, পাংশু ঠোঁট মনিবন্ধে ক্ষত
পাথরের মর্ম ছুঁয়ে উড়েছিল মৌন ধুলিকণা

দু'হাত জানুর কাছে শতদল ছুঁয়ে
প্রাচীন শীতগাথা, বেজেছিল একা
শরীর পোশাক তুলে, চেয়ে দেখি
বসে আছে-সুদূরের ডানা
চারদিকে হিম সন্ধ্যা, নগ্ন অপরূপ
ধুলায় মৌরীরেণু জ্যোৎস্নার ঋজু নমস্কার
সন্ধিপথে ডেকেছিল পাখি, সন্তানের বীজ
জানুর দরজা খুলে ভেসেছিল অগ্নি-ইশারা

সে তখন সন্ধ্যাকাল, জীবন অচেনা।

সনৎ মান্না

ভাঙে স্বাস্থ্য

পথ হারাবার মতো পথ নেই আর।
খেই আর, খুঁজে পাচ্ছি না ধূ ধূ বিজনে।
শুধু জীবনে, এই ক্ষয়ে যাওয়া একি মুখ্য ?
দেখি সূক্ষ্ম, গুঁড়ো গুঁড়ো মৃদু মৃত্যু ভাঙে স্বাস্থ্য।

অশোক দত্তচৌধুরী

এই সুলতানপুর

ল্যাবরেটারীর গিনিপিগ, ব্যাঙদের রক্ত-মাখা শরীরের কথা ভুলে,
মাঝে-মাঝে দেখি।
একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছো।
তোমার নামের দুটো শব্দ 'হেনা' নাড়াচাড়া ক'রে ;
আমি বুঝি, টুকরো-টুকরো কথা ছড়ানো রয়েছে।

এই সুলতানপুর, ল্যাবেরেটারীর হিম ঘর—
সাতমাস চ'লে গেলো, আরো সাতমাস যাবে।
জেনো, তারপর তোমাদের বাড়ি, ডাক্তার বসাক,
বুড়ো মালী, জমাদার সবকিছু ছেড়ে।
অন্য কোথাও আবার আমাদের চ'লে যেতে হবে।

হেনা, আজকাল সকাল ভীষণ দ্রুত চ'লে যায়, সন্ধ্যা যায়।
তাই বলি, যাও, তোমার নিজস্ব বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ো।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকো না, তুমি ওরকম একা।

গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী

একবার যদি

যদি তুমি কথার সারাৎসার একবার অন্তত
ফস্‌ফরাসের মত দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে ওঠো
মহাশূন্যের আলম্ব হৃদয়ে চিরায়ত ছড়াবো
জ্যোৎস্না নিয়ে হেঁটে যাবো অরণ্যের-কূট অন্ধকার

হাতে হাত রেখে বিলিন হয়ে যাবো পরস্পর
প্রান্তিক গম্ভীরায় বিস্তীর্ণ রাত্রি ছেয়ে নেবো গাঢ়
সবুজাভ ছায়ার ভেতর ফের ক্ষিপ্র ছুটে যাবো
মিশরীয় স্তব্দতুলিতে নক্ষত্রের রঙ মেশাবো।

অজয় নাগ

আসা

মেঠো বাগ্মিতায় বীজ মন্ত্রী
ছুটে যায় মানুষের আঙিনায়

"চাই কিছু পাঠ্যগ্রন্থ একাগ্রতা
এবারে পাস করা চাষী ফলাবে সোনা
সোনা আনবে টমাটো-বাঁধাকপি হকিটিম
এবং নতুন শব্দ সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ মোজা"

সন্দীপ সেন

কুমারী নদী

নির্জ্জনতায় ম্রিয়মান নিদ্রালু শিথিল সময়
খরার উত্তাপ বুকে নিয়ে
ভাদরের শেষে খোলা চোখে কেঁপে ওঠে নদী।
রূপ থাক আর নাই থাক
হিংস্র, কীট দুষ্টুনদী আর নারী
লাল লাল ঘাস বড় ভালবাসে।
চেতনার সবুজ মাঠে খাঁ খাঁ পোড়া রোদ্দুর
ধুধুজ্বলে প্রহরের প্রান্তরে সবুজ পাটের পাতা
তারই মাঝে রক্ত করবী দুলিয়ে
কুচি কুচি অগ্নিকণা, উত্তাপে আল্লেষে
খোলা চোখে যায় ভেসে কুমারী সে নদী।

শেখ মহরম আলি

আদিম ঈশ্বরী

পাহাড় ভেঙ্গে, আকাশ ভেঙ্গে, পড়ল মাটিতে, মাটিতে জল
ফুল ছিল আর আগুন ছিল, জ্বলছিল দশদিকে—
করুণ হাহাকার, কাঁপল পাতাবন, শ্মশান চিতার আলোয়
পুড়ছিল ফুল, পাপড়ি-রেণু, ঝরে যে যায়, ভালোবাসায় !

হায় কী দহন, বুকের ভিতর, রক্ত মাংসে, সংগে থাকা
লেপ্টে থাকা, আদিম ঈশ্বরী, সেই জলাভূমি, অসহ্য সুন্দর
যেন পাহাড় চূড়ায়, প্রথম দেখা রোদ, সহস্র বিস্ময় !

পাথর ছিল ভাঙ্গা-গড়ায়, মাটির বুকে চাষ, গাছ পুঁতে যাই
নির্জন মাঠ, মাঠের ছায়ায় নগ্ন শরীর, সবল পেশী, মোমের আলো
গলে যে যায়, সুখের কাছে, দু'হাতে সুখ, গায়ে মাখা, ভালোবাসায় !

নীল স্বপ্ন, চোখে কী ভয়, অরণ্য গভীর কে হেঁটে যায়, তুমি না ঈশ্বরী
পথ ভিজল জলে, ভিজেছে ঠোঁট রঙিন ঘাম—ঘ্রাণে, নিবিড় উষ্ণতা
করপুটে রক্তরাগ ছুঁয়েছে আগুন, পীড়ন অলৌকিক—
পাহাড় ভেঙ্গে, আকাশ ভেঙ্গে, পড়ল মাটিতে, মাটিতে জল !

সত্য বিশ্বাস

দেখা

বাতাসে ওষুধ গন্ধ, লাইজল ডেটলের কড়া গন্ধ ছিল
—চারদিক হাসপাতাল
তারই মধ্যে শুশ্রূষার বহুবিধ আয়োজন নিয়ে
কার কাছে যাবে বলে নাইটিংগেলের মতো এসেছিলে তুমি,
আমিও কি তারই কাছে পেতে চাই কুশল সংবাদ ?

হাসপাতালের খোলা জানালায় ছিল
বিকেলে বৃষ্টির ঘসাকাঁচ ক্যানভাসে শহরের ফিকে জলছবি

কপালের চূর্ণ চুলে চোখের পাতায় মিহি জলকণাগুলি
যে-পবিত্রতার শান্ত মৃদু আলো জ্বেলে দিয়েছিল
তোমার সহাস্য শুভ্র শুশ্রূষা আদলে
তার কাছে যেতে চেয়ে আমি এক করুণ ভিখারি।
মানুষের রোগ দুঃখ আর্তনাদ যন্ত্রণার আবহ সঙ্গীত আর
জীবন মৃত্যুর ক্ষীণ সীমানার কাঁটাতারে হাত রেখে বসে
কথা বলি পরস্পর, যে যার নিজের মধ্যে আরো ডুবে যাই
পুরনো রক্তিম ধুলোওড়ে, একগুচ্ছ পাতা উড়ে যায়

ছিন্ন রক্ত গোলাপের ধূসরিত স্মৃতির উপর
নূপুর ধ্বনির মতো অবিরত শাদা যুঁই বৃষ্টি ঝরে পড়ে
মৃত্যু নয় শোক নয়, নূপুর ধ্বনিতে ছিল জোয়ারের গান—
রক্তের সমুদ্র ঘিরে বেজে-ওঠা দারুণ দামামা !

প্রমোদ বসু

ভুলপ্রেম

তোমাকে এখনো দেখি অলিন্দে, জ্যোৎস্নায়
ভুলপ্রেম, সূচীশিল্পের মতো হাসো বিক্ষিপ্ত মায়ায়
শীত চলে গেছে কবে, আকুল বসন্ত এসে
ছাদের কার্নিস ঘিরে দাঁড়ায়।

পাতা ওড়ানোর মতো বাতাসে ভাসিয়ে দিই কথা ;
রাত্রি জুড়ে শুধু জেগে থাকে ব্যর্থ লিপিকুশলতা।

তোমাকে এখনো দেখি, ক্রোধের পরাগে
ভুলে আছো মৃত্যুবৎ, স্থবির।
কখনো কান্নায় ভেঙে বেসামাল চলে যাও একা,
নিজের শূন্যতাকে করো গভীর।

ভাঙো। ভেঙে চৌচির হয়ে বলো, 'আছি,
যে হারায় দিগন্তে একা, তার কাছাকাছি।'

শ্যামলকান্তি দাশ

তরবারি

১.
কে তাকে ফাঁসিতে লটকাবে
কারা তাকে চেনাবে শৃঙ্খল
অন্ধকারে খলখল খলখল
হেসে ওঠে নারী,
সামান্য বাতাস লাগে গায়ে
কেঁপে ওঠে নতুন জলের তরকারি।

২.
তরবারি উঁচিয়ে রাখে মেঘ,
বিছানার রাত্রিগুলি মানুষের মূর্তি হয়ে
বসে থাকে কাছে ;
ওই তো সামান্য দূরে বেঁকে গেল মৃদু জল
মন্দিরের গলিখুঁজি মানুষের
বসবাসযোগ্য হয়ে আছে।

শ্যামলকান্তি মজুমদার

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে জেগে ওঠো তুমি
কায়াহীন লব্ধ কল্পনায়
মন্দ্রিত সঙ্গীতে বাজো, বেজে ওঠো বুকে
চোখের সম্মুখে স্থির অস্ত নীলিমায়।
লগ্নবিকেলের ওই ছায়াঘন মুখে
প্রতিষ্ঠিত নও তবু উপলব্ধ চোখে
উজ্জ্বল ইঙ্গিতে পাই দুখজাগানীয়া।

দৃশ্যহীন এই থাকা জানালার কাছে
ঝিক্‌মিক্ জ্বলে ওঠা জোনাকি তারায়
কখনো জাহাজ হয়ে অনামি বন্দরে
স্থিতির নোঙর ফেলে গূঢ় অন্বেষায়।

ব্রততী সিংহরায়

আমার ক্যানভাস

আমার ক্যানভাসে ভাসে রক্তিম গালিচা
অশরীরী পা ও গুহার জোনাকি।
সমুদ্রগহনে ঝোড়ো হাওয়ায়
বলিরেখা মুছে যায়
মণিবন্ধে ফোটে জলছাপ।
ছবির প্রকাশ্যে কেঁপে ওঠে জ্বলন্ত প্রহর
সুদূরে পায়ে পায়ে এগিয়ে কে নিয়ে গেছে
শৈশবের বকুল অন্ধ জলাশয়।
রেখাচিত্রে ম্লান ছুঁয়ে থাকে ভ্রমর আঁধার
জীবনের আভাময় প্রপাতে ভাসে
নিকশ গোধূলি।
বর্ণের পরাজয়ে দৃশ্যমান ছবির শৃংখল খুলে
উড়ে যায় নিশ্চুপ পাখি
দেশান্তরী ছায়ার ফ্রেমে
অলৌকিক পা ও গুহার জোনাকি।

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বালির ঘর

আকাশ করেছে চাষ, জ্যোৎস্না জড়িয়ে আছে তুলো পেঁজা মেঘে
দারিদ্র্যে প্রোথিতমন জেনে গেছে, কীভাবে কোথায় আছে স্বপ্নের শেকড়
এখানে ফেরার কোনো কথা তো ছিল না, তবুও ভুবন দেখে দেখে
সকলেই বাড়ি ফেরে আমিও বালিতে বুঝি বেঁধে গেছি ঘর !

পুকুরের পাশে মাঠ, সাদা বাড়ি, স্বপ্নে ঠিক যেমন দেখেছি
ঘুম থেকে জেগে উঠি, জাগরণে নিরন্তর গাঢ় ঘুমে যেতে হবে বলে
গূঢ় অবচেতনার প্রতিটি ওষধি ক্ষণ সমারোহে সাজিয়ে রেখেছি

বেড়াতে এসেছি আমি, বিদেশীরা, খেলা শেষে দূরে যাব চলে
কোদালে কোপানো মেঘ, ওখানেই এ জীবন মিশে যাবে, জানি
হাতে ধরে ডেকে নেবে সেই বন্ধু, সর্বত্র ছড়ানো যার পুরানো পোশাক
দারিদ্র্যে প্রোথিত মন দেখে যায় অনিঃশেষ করপুটখানি
আমার বালির ঘর ওই দেশে গোপনে, নিভৃতে মিশে থাক !

প্রদোষ দত্ত

শিলালিপি

বসন্তবউরি পাখিটার কণ্ঠে সময় খেলা করে,
গাছে গাছে ফোটে ফুল।
অঘ্রাণের পাকা ধান কবে কেটে নিয়ে
গেছে চাষী—এখনও পড়ে থাকে
নাড়া-ওঠা মাঠ।
ভালোবাসা কৃষ্ণচূড়া হয়ে আগুন ছড়ায়—
বিষাদ ঘুরপাক খায় হাওয়ায় !
নবান্ন হয়নি আজও
চাষীদের ঘরে ঘরে,
ঝলসে ওঠে মধুমাস—পিরামিডের স্বপ্ন !
তবুও সহিষ্ণু উট ছুটে চলে,
সুপ্রাচীন শিলালিপি স্পষ্ট স্বাক্ষর রাখে
জড় ও জীবনের।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টিপাত

জুনের মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আরবসাগরীয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে ও বঙ্গোপসাগরীয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পূর্বাঞ্চলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বর্ষণ হয়। হিমালয়ে প্রতিহত হয়ে এই বায়ু আসাম ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি ঘটায়। খাশি পাহাড়ের চেরাপুঞ্জিতে বিশ্বের সর্বাধিক (১, ১২৬ সে. মি. অধিক) বৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ পশ্চিমমুখী হয়ে এই বায়ু তার প্রতাপ হারিয়ে ফেলে। এইভাবে কলকাতায় ১৪৪, পাটনায় ১০০, এলাহাবাদে ৮১, দিল্লীতে ৫৫ ও লাহোরে মাত্র ৪৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। কলকাতায় মৌসুমী বায়ুর সম্ভাব্য কার্যকাল ৮ জুন থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ১৩০ দিন।

বজ্র, বিদ্যুৎ ও বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র। দেবমাতা আদিতির গর্ভে মহর্ষি কাশ্যপের ঔরসে ইন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার রাজ্য অমরাবতী, উদ্যানের নাম নন্দন (তথায় পারিজাত বৃক্ষ আছে), প্রসাদের নাম বৈজয়ন্ত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, সারথি মাতলি অস্ত্র বজ্র ও পত্নী শচী। এ ছাড়া আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত বহুবর্ণ রঞ্জিত একটি ধনুও আছে এবং ইন্দ্র গোপনে গুরু পত্নী অহল্যা ও অনূঢ়া রাজকন্যা কুন্তীর সঙ্গে উপগত হয়েছেন। অহল্যাকে সঙ্গমের অপরাধে গুরু গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্রটি যোনি চিহ্ন হয়েছিল। অবশ্য এই সব যোনিতে চুল ছিল না বা এগুলি ব্যবহার্য ছিল না। পরে ব্রহ্মার আনুকূলে ও দুজন ঘোড়া-ডাক্তারের চিকিৎসায় এগুলি চক্ষুতে রূপান্তরিত হয়। ইন্দ্র কামাসক্ত, ভীরু ও ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। তিনি অনেক অসুরকে পরাস্ত করেন ও অনেকবার তাদের দ্বারা পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কাছে সাহায্যের আশায় দৌড়োদৌড়ি করেন। অহল্যা ও কুন্তী ছাড়াও সম্ভাব্য শত্রু নিজের

বৈমাত্রেয় ভাইকে খুন করার জন্যে ইন্দ্র নিজের মাসিমা ও বিমাতা দিতির যোনিপথে গর্ভে প্রবেশ করেন। রাজ্য হারাবার ভয়ে তিনি বারবার মুনি ঋষিদের তপস্যার সময় স্বর্গের বেশ্যাদের পাঠিয়েছেন ও রাজাদের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করেছেন।

একদা ইন্দ্রের ক্রোধে অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়। প্রজারক্ষার্থে অঙ্গরাজ লোমপাদ ব্রাহ্মণদের পরামর্শে ঋষ্য শৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে আনালেন। মুনি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ছিলেন, তাই তাঁকে আনতে একদল সুন্দরী বেশ্যা পাঠান হয়। ঋষ্য শৃঙ্গের আগমনে অঙ্গরাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। রাজা খুশি হয়ে নিজের পালিতা কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলেন। অতঃপর রাজকন্যার অঙ্গরাজ্যে মুনি প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ঘটালেন।

আজকের (১৬. ৯. ৮৩.) আবহাওয়া সংবাদ ঃ—শনিবার কয়েক পশলা বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবারও সারাদিন আবহাওয়া ছিল বাদলে। সন্ধে পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৬. ৯ মিলি মিটার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিক—যথাক্রমে ৩১· ৬ ও ২৬·৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

ভারতের মত দেশে বৃষ্টিপাত খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পরিমিত বৃষ্টিপাতে চাষবাস ভালো হয়। মূল্যমান সন্তোষজনক হয়। নেতারা ভোট পায়। কৃষক, ত্রিপল ও ছাতা ব্যবসায়ী, ভেক, ময়ুর ও কবিরা খুশি হয়। অনাবৃষ্টিতে জিনিষের দরবাড়ে, খরাত্রাণে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের দাবী সোচ্চার হয়। 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেবো মেপে' বললে বৃষ্টি আসে আর 'লেবুর পাতায় করমচা' যা বৃষ্টি থেমে যা' বললেই বৃষ্টি থেমে যায়।

উৎপল চৌধুরী

বুড়ি ছোঁওয়া

অসীম আনন্দে এক মানুষের বরফ গলছে
ভয়ানক বেদনায় একজন নিথর পাথর,
গাঁইতির বুকফাটা শব্দে গাঁথা এক ইঙ্গিত
ক্রমান্বয়ে এইসব ছুঁয়ে দিতে ব্যর্থ একজন ।

রাত্নেশ্বর হাজরা

দিনগুলো

ভীষণ বিচ্ছিরি এই দিন কোনকিছু
ভালো না লাগার
ভীষণ অস্থির এই দিন মহাভারতের
যুদ্ধশেষ সন্ধ্যা যেরকম
একটুও ভালো না লাগার অবয়ব
অবশ এবং ক্লান্ত দিন
ভোর থেকে সন্ধ্যার পরেও বহমান
আহ্নিকগতির চিহ্নমালা
সিঁড়ি ভেঙে ওঠা আর নামা·····
জলের ভিতরে ছায়া—সেই
জলকে নাড়িয়ে ছায়া ভাঙা
ভীষণ ভিড়ের মধ্যে চলা পিষে যাওয়া
কেবল অস্থির মানসিক
বিরক্তিতে
অমিল এবং
অবসাদে গ্রস্থ সারাদিন

দেবপ্রসাদ মিত্র

অ-নৈষাদিক

আমাকে লেহন করে লোলুপ সময়
বারবার ভাবি অস্থি, মাংস খুঁজে নেব এবার,
নির্ঘাত নিষাদ হব রক্তাক্ত শিকারে
তবু গোপন ভুবন মেলে মেলে মুগ্ধ করে বনভূমি
মৃগয়া ভুলে মৃগের চোখ দেখি আমি !
এভাবে কৃশতা আনে দীর্ঘ উপবাস,
সারারাত শিকারের স্বপ্নে চূর্ণ হয় ঘুম।

সঞ্জীব প্রামাণিক

মীমাংসা

সব সহ্য করে যাবো ; যতদিন না খুলেছো চোখ।
হাত ধরে রাস্তা পার করে দেব, মমত্ব দেখাবো ;
সব সহ্য করে যাব ; যদি বলো জ্বলো এ আগুনে
জ্বলবো, আর মাঝে মাঝে টেনে ধরবো চোখের দুপাতা।
যদি তুমি আলো দেখতে চাও, তাও দেখাবো ;
তোমার ভেতর থেকেএকদিন ছেড়ে দেবে তো আমাকে ?

আমিই আলোর পুরুষ; লুকাতে চেয়েও ফের বেরিয়ে এসেছি-
না-বাহির না-ভিতর ভালো লেগে। বলেছি ধরো এ হাত ;
রাস্তা পার করে দেব দায়িত্ব মাথায় তুলে—
তুমি শুধু ধরে থাকো দুহাতে আমাকে।

দেবী রায়

শব্দের আক্রোশ

উল্লাসে মুর্হুমুর্হু, ফাটায় বাজী
অবশ্য-ই তারা, কাজের কাজী !

—আর আমি ?
সে কি খুব কৃপণ .....যে স্বয়ং নিজেকে

নিয়ে ব্যস্ত অনিবার !
'—কেন করো সাধাসাধি ?'

কে পরিতৃপ্ত এ দুনিয়ায়
যদি পায় আধাআধি ?

শব্দের আক্রোশ থেকে
পাবো কি মুক্তি, নিস্তার ?

কার্তিক বৈরাগী

সুখ নেই

যদি কোথাও যাবার হতো চলে যেতাম
যে ভাবে জল, নদী, পথ চলে যায় নিরুদ্দেশে,
যদি তেমন কাউকে কাছে পেতাম বলতাম
আমি দুঃখী, কতো দুঃখী, সুখে নেই।
আমার কি যে অসুখ কেউ জানে না
আমি হাসি খেলি গান করি
সময় পেলে কাঁদি কাউকে বুঝতে দিই না
ভালোবাসলে কাছে ডাকলে কিছুতে আসতে চায় না
আলেয়ার দিকে আঙুল দেখায়।
আমার স্বপ্ন দেখা আর হল না
মোদিনার দিকে যেতে যেতে থেমে গিয়েছি
সেই থেকে কেবল জলের শরীর দেখে কল্লোল শুনেছি
স্পর্শ করিনি কোনো স্বপ্নের নারীকে
বার বার ভেবে দুঃখ পাই
মনে হয় আমি দুঃখী কতো দুঃখী, সুখে নেই।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

নীবার মঙ্গল কাব্য

পদ্মফুল ফুটিয়াছে তুমি যদি ওষ্ঠ স্পর্শ কর
তোমাকে দেখার জন্যে আঁখি লক্ষ্ম কাজল প্রখর
কান পাশা এই সিঁথি পরিনি নিজের কোন শখে
ক্ষার জলে বিধৌত উড্ডীন চূর্ণ অলকে
নিজেকে সুন্দর করি শোভা পেতে তোমার ও বুকে
তুমি অন্যত্র গেলে চলে পাব রৌরব নরকে
কণ্ঠে তুলে নেব বিষ হাতে তুলে নেব আমি
সুরার বোতল

সম্মুখে আসবে যেই তার তো নিস্তার নেই
যে পুরুষে করব কোতল
আর যদি আমার এ সমর্পণ সাদরে গ্রহণ কর
মেনে নাও ধীরে
সহিষ্ণু পৃথিবী হবে নীবার মঙ্গল কাব্য
লিখে যাব শস্যের রুধির দিয়ে
আমার এ বক্ষের ক্ষীরে

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে আছে

আজ বৃষ্টির দিনে তোমার কথা মনে পড়লো
আমি ভারশূন্য চুপচাপ বসে আছি একা
মনে পড়ছে আজ আমাদের বিবাহ বার্ষিকী
হয়তো এসবই স্বপ্ন দূর অতল ভাবনা
ফুল পাখি গাছ গাছালি আজ নতুন
ঋতু বদলের সময় এখন

তোমার চাহনি দেখি ফ্রেমে অমলীন
কত বছর মনে আছে তোমার
দিন যায় মাস যায় বছর ঘুরে আসে
পুরোনো গন্ধ কথা স্বর কিংবা ঝংকার
কিছুই এ ঘরে নেই

অবসাদ নিয়ে চেতন বিষাদে এই ঘর
বাইরে অঝোরে বৃষ্টির শব্দ
হাওয়া আসে জারিত করে রোজ
কত বছর হোল-মনে আছে তোমার··· .....

রাখাল বিশ্বাস কর্তৃক ৩২ গ্রাণ পার্ক কলকাতা ৫৬ থেকে প্রকাশিত ও জাগরণী প্রেস কলকাতা ১২ থেকে মুদ্রিত।